প্রথম আলো

কলাম

মতামত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি কোনো দিন বিশ্বমানে পৌঁছাবে?

লেখা: সুলাইমান নিলয়

প্রকাশ: ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০: ৩২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় *ফাইল ছবি*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছি বহু বছর হতে চলল। কিন্তু ভালোবাসা কমে না। এত দিন পার হলেও এই ক্যাম্পাসের জন্য হৃদয়ে এখনো কলকলে দুটি স্রোত বয়ে যায়। একটি উচ্ছ্বাসের, আরেকটি মন খারাপের। দুইটিই তীব্র। দুটোই এসেছে ভালোবাসার দহন থেকে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসাটাই আমার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যা আমার সবকিছুকে বদলে দিয়েছে। শুরু হয়েছে জীবনের নতুন স্তরের উত্তরণ পর্ব। এরপর জীবনের কত কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে মল চত্বরের প্রিয় রাস্তা, মধু-হাকিম-টিএসসির আড্ডা। ঘুমানোর জায়গা না পেয়ে ছাদে গিয়ে তারার সঙ্গে স্বপ্ন বোনার স্মৃতি।

প্রিয় শিক্ষক, প্রিয় বন্ধু, প্রিয় মেন্টর, প্রিয় বড়/ছোট ভাই/বোন। প্রথম প্রেমের এই ক্যাম্পাস সাক্ষী আমার প্রথম বিচ্ছেদেরও। হৃদয় কেঁদেছে আর কত কত আবেগে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, বন্ধু আবু বকরের মৃত্যু। মৃত্যু নয়, হত্যা।

আমার মনে হয়, সেই হত্যারহস্য যথাযথভাবে উদ্ঘাটিত হয়নি। এখন পেছনে তাকালে মনে হয়, এই রহস্য বের না করতে পারার দায় আমারও। আরেকটু চেষ্টা করলে সাংবাদিক হিসেবে কাজটি আমি করতে পারতাম। তবে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে মন সবচেয়ে বেশি খারাপ হয় স্বপ্নভঙ্গের বেদনায়।

দূর গাঁয়ে বসে আমি দুটি স্বপ্ন দেখতাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আমি কার্জন হলে থাকব। জি, ঠিকই পড়ছেন। কার্জন হলে থাকার স্বপ্নই আমি দেখতাম আর ভাবতাম, আমি পৃথিবীর এমন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব, যার মতো বিশ্ববিদ্যালয় আর একটাও নেই।

কার্জন হলে যে থাকা যায় না, এমনকি গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে পড়লে সেখানে যে ক্লাসও করা যায় না—সেটা আমি জেনেছি ক্যাম্পাসে আসার পর।

তবে এর চেয়েও বড় স্বপ্নভঙ্গের কষ্ট আমি ক্যাম্পাসেই পেয়েছি। আমার প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় যে এমনটাও হতে পারে। সেটা আমি কোনো দিনই ভাবতে পারিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার আগে আমার মনে হতো, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভাষা আন্দোলন করেছে, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে একটি জাতির জন্মযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে, সেটা আমাকেও এমন অবস্থানে নিয়ে যাবে, আমিও দুনিয়ার সেরা হয়ে উঠব।

তখন ২০০৭ সাল। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের রমরমা প্রযুক্তি তখন ছিল না। ব্যাগে ল্যাপটপ, হাতে হাতে স্মার্টফোন ছিল না। ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে নিবন্ধন করে কার্ড কিনে সাইবার সেন্টারে যেতে হতো। ক্যাম্পাস রিপোর্টাররা ফ্যাক্সে খবর পাঠাত অফিসে। কম্পিউটারের মাউস ধরা, অন-অফ করা আর টাইপিং-এর মতো কিছু বেসিক কাজ শেখাতে একটি কোর্স ছিল আজিজ সুপার মার্কেটে। এটাকে আমরা বলতাম, কম্পিউটার শেখা। তার বিজ্ঞাপন ছিল ক্যাম্পাসের নানা দেয়ালে। প্রযুক্তি কতটা দুর্বল ছিল, তা অন্যভাবেও বোঝানো যেতে পারে। একটা মোবাইল কোম্পানির বিজ্ঞাপন ছিল, 'ল্যাপটপের সঙ্গে তাদের ইন্টারনেটের মডেম নেওয়া ব্যক্তি হচ্ছে ক্যাম্পাস হিরো'।

বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পর একসময় আমি জানতে পারি, আমাদের বিভাগের রয়েছে একটি কম্পিউটার ল্যাব। শুনেই মনে হলো থাকতেই হবে। এ আমার গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ। সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা বিভাগ। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় এই ল্যাব।' আমাকে জানানো হলো, কলাভবনের পূর্ব-উত্তর কর্নারের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলে একসময় পেয়ে যাব সেই ল্যাব।

এক দৌড়ে চলে গেলাম। দৌড়ের সেই গতিটা এখন থাকলে ম্যারাথন জেতার চিন্তা করতাম।

আমার জবাব, কম্পিউটার শিখতে এসেছি। জবাবে আমাকে বলা হলো, এটা কম্পিউটার শেখার জায়গা না। বলতে গেলে তাড়িয়ে দেওয়া হলো সেখান থেকে। পরিচয় দেওয়ার পর জানতে পারলাম, একটি নির্ধারিত কোর্সওয়ার্কের সময় এখানে আসা যাবে। কিন্তু বাকি সময় এই কম্পিউটারগুলো পড়ে থাকবে? এই প্রশ্নের জবাব আমি কারও কাছেই পাইনি।

তখন কোনো ঘরে কম্পিউটার থাকলে সেখানে জুতা নিয়ে প্রবেশ না করার একটা সংস্কৃতি ছিল। এসব আমি ভালোই জানতাম। সে মোতাবেক জুতা বাইরে রেখেই খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে চলে গেলাম। হই হই করে একজন তেড়ে আসলেন, এসেই চেক করে দেখলেন, আমি জুতা পায়ে ভেতরে এসেছি কি না। আদব মেনেছি দেখেও তিনি শান্ত হলেন না। যেন মারমুখী গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তুমি। কেন এসেছ?'

আমার জবাব, কম্পিউটার শিখতে এসেছি। জবাবে আমাকে বলা হলো, এটা কম্পিউটার শেখার জায়গা না। বলতে গেলে তাড়িয়ে দেওয়া হলো সেখান থেকে। পরিচয় দেওয়ার পর জানতে পারলাম, একটি নির্ধারিত কোর্সওয়ার্কের সময় এখানে আসা যাবে।

কিন্তু বাকি সময় এই কম্পিউটারগুলো পড়ে থাকবে? এই প্রশ্নের জবাব আমি কারও কাছেই পাইনি।

পরে একদিন জানতে পারলাম, আমাদের একটি ফটো ল্যাবও আছে। মফস্‌সলের সাংবাদিকদের দেখে বড় হওয়া মানুষ আমি। যেখানে সাংবাদিক মানেই হাতে ক্যামেরা। তখন মনে হলো, কম্পিউটার না ধরতে দিলেও ক্যামেরাটা চালাতে দেবে। এরপর ভয়ে ভয়ে সেই ল্যাবের দরজায় কড়া নাড়তে গেলাম। সপ্তাহ চলে যায়, সেই ল্যাবের সামনের করিডর ঘুরে আসি। এদিক-সেদিক তাকাই। আশপাশে আড্ডা দিই। ল্যাবের দরজা আর খোলা পাই না। একদিন জানতে পারলাম, বিভাগে সিনিয়র হলে কোর্সওয়ার্কের সময় এই দরজা খুলবে। এটাই নাকি নিয়ম।

ল্যাবের গল্প যার কাছে শুনেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, 'বিটিভির সঙ্গে তুলনা করে আমরা ক্যামেরা ও যন্ত্রপাতি এখানে এনেছি।' কিন্তু আমার শূন্য হৃদয়ে সেই দিনই মনে হয়েছিল, এই ল্যাব দিয়ে কী হবে, যদি সর্বোচ্চ ব্যবহারই নিশ্চিত করা না যায়।

বড় হয়ে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে গিয়ে জেনেছি, অ্যাপ্রেনটিসশিপ প্রোগ্রামের আওতায় শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলাও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ। তাই সেখানে বিভাগের ক্যামেরা-ল্যাপটপ-গ্রিন স্ক্রিন-এডিটিং ফ্যাসিলিটি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা যত খুশি নিউজ স্টোরি তৈরি করে।

ডয়চে ভেলেতে ইন্টার্নশিপ করতে কর্মজীবনের একটা পর্যায়ে আমি জার্মানি গিয়েছিলাম। সেখানে পরিচয় হয় নানা দেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে। একদিন হঠাৎ করেই আমার কাছে মনে হয়েছিল, স্টোরি টেলিংটা যদি আমাকে

প্রায়োগিকভাবে আরেকটু ভালোভাবে কেউ শেখাত। সর্বশেষ প্রযুক্তির সঙ্গে আমি ভালোভাবে যদি পরিচিত থাকতাম। ইংরেজিতে স্বাচ্ছন্দ্য হতাম। যদি আরেকটি ভাষা শিখতাম। ব্যস, তাহলেই আমি পাল্লা দিতে পারতাম সেখানকার যেকোনো ব্যক্তির সঙ্গে। কষ্টের কথা কি জানেন? বিদ্যমান সম্পদ দিয়েই এর পুরোটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় করে দিতে পারত।

যে আয়োজনে আমি ডয়চে ভেলেতে গিয়েছিলাম, সেটাও বিভাগের ব্যবস্থাপনায় হতে পারত। সে আর হবে কীভাবে, আমরা সাংবাদিকতা করতাম বলে বরং নানা কথা শুনতে হয়েছে। সেটা আবার প্রিয় শিক্ষকদের মুখেও। এমনও কথা শুনেছি, সাংবাদিক বানানোর জন্য সাংবাদিকতা বিভাগ নয়। তবে এত সবের মাঝে চতুর্থ বর্ষেই আমরা মূলধারার গণমাধ্যমে ৪০ জনের বেশি কাজ করতাম। তত দিনে আমাদের ব্যাচের আকার কমে ৫৫ জনের আশপাশে চলে আসে। অর্থাৎ ৫৫ জনে ৪০ জন।

যাহোক, আমার এখনো মনে হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তেজ বা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা এটাকে বিশ্বমানের একটা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তুলতে পারি। এটা আসলেই এতটা কঠিন কাজ নয়।

এখন বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গরম-গরম অনেক আলাপ চলছে। তার মাঝে আমি আমার বিভাগ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ নিয়ে আমার স্বপ্নের কথা বলতে চাই। আমার প্রস্তাবনা নিম্নরূপ।

১. বিভাগের কারিকুলামকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে এটি কেবল বাংলাদেশের সেরা সাংবাদিকতা ও কমিউনিকেশন বিভাগ হয়ে উঠবে না। বরং ক্রমে সেটা দক্ষিণ এশিয়া, এশিয়া—এমনকি বিশ্বসেরা হয়ে উঠবে। এটা করা সম্ভব। এরপর বিশ্বমান বজায় রেখে নিয়মিত সেটা আপডেট করা হবে।

২. সম্মান শ্রেণিতেই কমিউনিকেশন ও সাংবাদিকতার আলাদা মেজর ঠিক করার সুযোগ তৈরি হবে। পঞ্চম বা ষষ্ঠ সেমিস্টারে গিয়ে এটা ঘোষণার সুযোগ রাখা যেতে পারে। প্রয়োজনে আরও নানা মেজর থাকতে পারে। গবেষণার জন্য আলাদা মেজর থাকতে পারে। ডেটা সাংবাদিকতার মতো প্রায়োগিক বিষয়গুলোকেও সামনে আনা যেতে পারে। মেজর অনুসারে কর্মজীবনে বিশ্বসেরা প্রতিষ্ঠানে যে কাজ করবে, সেই জন্য প্রস্তুত করা হোক।

৩. কীভাবে আমরা বুঝব, এই বিভাগ দেশসেরা, দক্ষিণ এশিয়ার সেরা বা বিশ্বসেরা হয়ে উঠছে। নানা জন নানাভাবে এটার ব্যাখ্যা করতে পারে। আমি আমার মতো করে বলছি। প্রথমত, সাংবাদিকতা যারা করবে, কমিউনিকেশনে যারা কাজ করবে, গবেষক যারা হবে—এই সব শ্রেণিকে আলাদা আলাদাভাবে বিবেচনা করি। এই তিন শ্রেণির সবচেয়ে ভালো দেশীয় প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তারা যখন চোখ বন্ধ করে এই বিভাগের শিক্ষার্থীদের তাদের প্রতিষ্ঠানে নেওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠবেন, তখন বোঝা যাবে, আমরা দেশসেরা হয়েছি। যদি দক্ষিণ এশিয়া বা এশিয়ার নিয়োগকর্তাদের এই ভূমিকায় দেখা যায়, তাহলে বোঝা যাবে, দক্ষিণ এশিয়া বা এশিয়ায় আমরা সেরা হয়ে উঠছি। যদি দেখা যায়, এখান থেকে ইন্টার্ন করতে শিক্ষার্থীরা বিবিসি, আল-জাজিরা বা জাতিসংঘের

হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছে, তখন বোঝা যাবে আমরা একটা বিশ্বমান অর্জন করছি। সেখানে হরহামেশা নিয়োগ পাচ্ছে, তখন বোঝা যাবে আমরা বিশ্বমান অর্জন করছি।

যারা এই সব প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তরে যেতে পারবে না, তাদের বিশ্বমান বোঝার অন্য উপায়ও আছে। যদি জাতিসংঘ বা তাদের কোনো সংস্থা কোনো গবেষণার জন্য আমাদের বিভাগকে কমিশন করে, সেই গবেষণা হয়তো ঢাকা থেকেই আমাদের বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা করবে। যখন এমন সময় আসবে, তখন বোঝা যাবে, আমরা বিশ্বমান অর্জন করছি।

বোঝার আরেকটা উপায় আছে, বিভাগের কারিকুলাম এমন হবে যে এখান থেকে ইন্টার্নশিপ করতে কেউ বিবিসিতে গেলে সেখানে কেবল ওই শিক্ষার্থী উপকৃত হবে না। বরং বিবিসির নিউজ রুমের অন্যরাও ইন্টার্নের কাছ থেকেও কিছু না কিছু শিখবে। এমন কিছু, যা বিভাগ তাকে শিখিয়ে দিয়েছে। লেবাসে এবং পরিবেশে এমন ইনোভেশনের দ্বার খুলতে হবে, যাতে এগুলো ভাত-মাছ হয়ে যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির নাইট ল্যাবের কথা বলা যেতে পারে। সব সময় ইনভেনশন নিয়েই নিউজ রুমে যেতে হবে, বিষয়টা তা-ও নয়। অন্য কারও উদ্ভাবিত নতুন জ্ঞান অন্যদের তুলনায় আগেভাগে রপ্ত করাও বিরাট পদক্ষেপ। আমাদের সময়ে রিপোর্টার হতে চাওয়া সবাইকে শুরুর দিকেই কম্পিউটার, ক্যামেরা চালানো শিখিয়ে দিলে সেটা বিরাট পদক্ষেপ হতো। এখন কনস্ট্রাকটিভ জার্নালিজম, মাল্টিমিডিয়া, ডেটা জার্নালিজম শিখিয়ে পাঠালেও সেটা হবে।

৪. বিভাগের বৈশ্বিক উত্তরণে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম মানুষদের বিভাগে নিয়ে আসা হোক। সরাসরি বিদেশি ফ্যাকাল্টি আনার প্রয়োজন হতে পারে। দেশের যোগ্য সন্তানেরা পৃথিবীর নানা প্রান্তে কাজ করছে, তাদের অনুরোধ করে এনে বিভাগে যুক্ত করা যেতে পারে। তবে এই পয়েন্টটির গুরুত্ব অন্যগুলোর চেয়ে বেশ কম। বিভাগের শিক্ষকেরা নিজেরাও চাইলে এখানে নেতৃত্ব দিতে পারেন।

৫. ভর্তিপ্রক্রিয়া, শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকাল এবং কর্মজীবন—এই তিন স্তরকে সামনে রেখে পরিকল্পনা হোক। শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি হোক। একটা নির্দিষ্ট মানে সব শিক্ষার্থীকে উন্নীত করে এখনকার শিক্ষাজীবন শুরু হোক। কেউ পিছিয়ে থাকলে তার জন্য প্রি-একসেস কোর্স চালু হোক, প্রয়োজনে প্রি-একসেস সেমিস্টার হোক। চট্টগ্রামের এশিয়ান উইমেন ইউনিভার্সিটিতেই এ রকম' একসেস একাডেমি' আছে। মনে করেন, চা-বাগানের শিশুরা তো নামীদামি ইংলিশ মিডিয়ামের শিক্ষার্থীদের মতো একই সুবিধা পেয়ে বড় হয়নি। তাদের একসেস একাডেমির মাধ্যমে অন্যদের সমপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তারা মূলধারায় যোগ দেয়।

ওপেন ক্রেডিট সেমিস্টার হোক। বিভাগে এমন অনেক বৃত্তি চালু করা হোক, যাতে যাদের প্রয়োজন তাদের থাকা-খাওয়া ইত্যাদিতে সহায়তা প্রদান করা যায়। হলে সিট না পাওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিভাগের ব্যবস্থাপনায় নামমাত্র মূল্যে হোস্টেল হোক। এমন তহবিল গঠন করা হোক, যাতে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ এবং শিক্ষার পরিবেশ তৈরিতে

অর্থ কোনো সমস্যা না হয়। এমনভাবে সেফগার্ডিং পলিসি তৈরি হোক, যাতে শিক্ষার্থীদের যৌন হয়রানি তো দূরে থাক, মন খারাপ করে দেওয়ার মতো কথা বা কাজ করতেও কেউ ১০ বার ভাবে।

একটি বা দুটি আবাসিক সেমিস্টার হোক, যাতে সেখানে সমন্বিত শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যায়।

৬. বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ তৈরি হোক। অন্যান্য বিষয়েও সমঝোতা তৈরি হোক। নির্দিষ্ট কিছু কোর্স করার জন্য শিক্ষার্থীদের দেশে-বিদেশে পাঠানো হোক। বিদেশ থেকেও শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের একই উদ্দেশ্যে নিয়ে আসার সুযোগ তৈরি হোক।

৭. একটি স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি এবং একটি দীর্ঘমেয়াদি ‘অ্যাকশন প্ল্যান’ তৈরি করা হোক।

আমি আমার বিভাগের কথা বললাম। আমি চাই, অন্যরাও যার যার বিভাগ নিয়ে বলুক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বসেরা বানানোর আলাপ উঠুক।

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে কতজন কত ইশতেহার দিচ্ছে। তরুণ প্রাণে স্বপ্ন জাগানোর চেষ্টা করছে। বিশ্বমানে পৌঁছাতে এর অনেক কিছু আসলেই আমাদের দরকার। কিন্তু একটি সমন্বিত বাস্তবমুখী উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা আর আর সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একদল পাগল প্রাণ মানুষের ঐকতান না থাকলে আমরা দুনিয়ার সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারব না। তখন অন্য অনেক বাহ্যিক সুবিধা নিশ্চিত করেও লক্ষ্যহীন যাত্রার কারণে গন্তব্য কঠিন হয়ে যেতে পারে।

- **সুলাইমান নিলয়** ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, সাংবাদিকতার প্রশিক্ষক ও উন্নয়ন পেশাজীবী

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো